

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় : দায়বদ্ধতা থেকেই কালিমা ঘোচাতে হবে



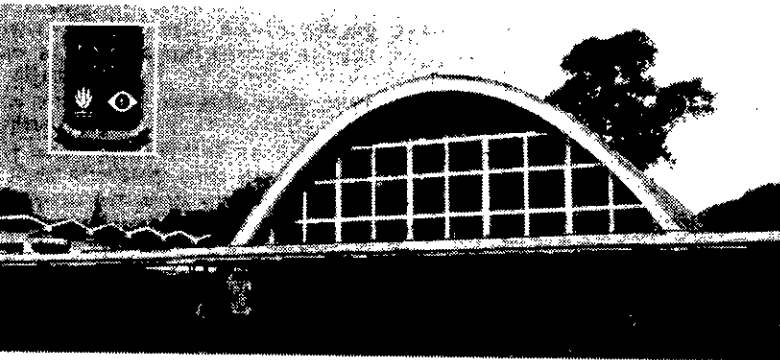
সময় কত দ্রুত চলে যায়। এই তো সে দিন, হাতে একটি ছোট ব্যাগ আর কয়েক মাস আগে দেহান্তরিত শিক্ষক বাবার স্মৃতি ও মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে কুমিল্লার একটি ক্ষুদ্র ছায়াঘেরা

সবুজ-শ্যামল গ্রাম থেকে মেঠোপথে হেঁটে প্রায় আট কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পাড়ি দিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে ভীরা পদে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের করিডরে প্রথম পা রাখলাম। বিকম অনার্সে ভর্তি হলাম। প্রথম দিনেই সাবসিডিয়ারি ইকোনমিক্সের ক্লাস। ঘড়ির কাঁটার ঠিক ১০টায় ক্লাসে এসে ঢুকলেন সৌম্য-শান্ত চেহারার একজন শিক্ষক। ড. রেহমান সোবহান, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ। প্রাণপণে ভাবেই তিনি গুরু করলেন ইংরেজিতে লেকচার দেয়া। বিষয় ছিল পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যমূলক অর্থনীতির বিশ্লেষণ। তার প্রাণবন্ত আলোচনা আমাদের সবাইকে এত বেশি মুগ্ধ করে রেখেছিল যে, কখন ক্লাস শেষ হল তা টেরই পাইনি। এমন প্রভাষণ শুনেছি অনার্সের সব ক'টি ক্লাসের শিক্ষকদের কাছ থেকেই— ড. এমএন হুদা, ড. আবদুল্লাহ ফারুক, ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, ড. মো. হাবিবুল্লাহ প্রমুখ। এই যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বসে থাকা, তা কি এখন এই ২০১৭ সালে আছে? একেবারেই যে নেই, তা অবশ্য বলব না। কিন্তু অতি সামান্য। কারণ কী? আমাদের শিক্ষার্থীরাই অভিযোগের সূরে বলে : বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার গুণে-মানে ধস নেমেছে। কেন এমনটা হচ্ছে? বিষয়টি সিরিয়াসলি পর্যালোচনা করা জরুরি। নতুবা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিত এ বিদ্যায়তনটির সুনাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে ইতিহাসের অতলে। ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করেছি আমার আলমা-মাতের এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্প্রতি অবসর নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতি রয়েছে অসীম আবেগ-অনুরাগ। সে কারণেই লেখাটি।

কয়েকদিন ধরে পত্রিকার পাতায় আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় দেখতে পাচ্ছি, কড়া সমালোচনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতিক একটি ঘটনার। ঘটনাটি দলীয় সভায় শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষকের হাতাহাতি। কেউ বলছেন, তক্তিত হওয়ার মতো ঘটনা; কেউ বলছেন নাকারজনক, কলঙ্কিত, অরুচিকর, লজ্জাজনক ও 'নোংরামির চূড়ান্ত রূপ'; আবার কেউ বলছেন, নোংরা দলাদলি ও রেষারেষি। ঘটনাটি হাতাহাতি আর মৃদু মারামারি। সারা দেশে এত হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। তা নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এটিকে নিয়ে এত পোরগোল কেন? কারণ আছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সাধারণ মানুষের হাতাহাতি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতাহাতি একেবারেই ভিন্ন বিষয়। ছাত্রজীবন আর কর্মজীবন মিলিয়ে ৪৬ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনিটুক কখনও দেখিনি, শুনিওনি। তবে প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল ১৯৮৯ সালের এক বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় রূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায়। একটি বিষয়ের ওপর আলোচনা পর্বে পাশাপাশি বসা দু'জন সিনিয়র শিক্ষকের একজন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে অন্যজনের নাকের তপায় কাছে মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে 'দিব কিন্তু একটা' এমনটি বলে চিৎকার করে হুঙ্কার দিচ্ছিলেন। আমি কাছাকাছি একটি চেয়ারে তখন সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সভা পরিচালনা করছিলাম। অবস্থা দেখে ভূরিত উঠে এসে উত্তেজিত হাতটি ভ্রমভাবে ধরে বসিয়ে দিয়েছিলাম। অনেক সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার সঙ্গে ধতাধস্তি করেননি। ব্যাপারটা আলোচনা করে আমরা সেখানেই মিটমাট করে দিয়েছিলাম। তিন মাসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে কিংবা এরপর আর কখনও এমন ঘটনা ঘটতে দেখিনি। উল্লিখিত দু'জন শিক্ষকই পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ছোটখাটো মনোমালিন্য হতেই পারে। একে বড় রূপ দেয়ার চেষ্টার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। এক সময় গোলাপি দল থেকেই নীল দল—এর সঙ্গে একীভূত হওয়ার প্রস্তাব দেয়। গোলাপি দলের কয়েকজন এতে হিমত পোষণ করে সাদা দলে যোগ দেন। অধিকাংশই নীল দলের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। আর কয়েকজন গোলাপি দল নিয়েই এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এদের দলে নেয়া না নেয়া নিয়ে এত আরও কিছু বিষয়ে মতবৈধতার কারণে এক সময় নীল দলের মধ্যে ভাঙনের আশঙ্কা দেখা দেয়।

'সবুজ দল' নামে একটি নতুন দল প্রায় হয়েই যাচ্ছিল; কিন্তু সিনিয়র শিক্ষক নেতাদের যথার্থ ও সমরোপযোগী হস্তক্ষেপের কারণে দল ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পায়। একটুও হাতাহাতির সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। অথচ এখন কেন এত অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা? এ ব্যাপারে সিনিয়র শিক্ষকদের মতামতের ভিত্তিতে একটি দৈনিক পত্রিকার মতব্যা এরাপ : 'প্রধানত ছয়টি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ শিক্ষক রাজনীতিতে জড়াজেন। এগুলো হচ্ছে— প্রবেশপদে নিয়োগ, পদোন্নতি, বাসা বরাদ্দ, নিজের অথবা অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগ এবং সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নেয়া' (যুগান্তর, ৫.১১.২০১৭)। এ মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া কঠিন, আবার হিমত পোষণ করাও কঠিন।

রাজনীতিকে এখানে দোষারোপ করা হচ্ছে। শিক্ষকদের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা দোষের কেন? শিক্ষকরা রাজনীতিমন্ডল ছিলেন বলেই বাংলাদেশের ইতিহাস বদলেছে; বিশ্ব এটলাসে নতুন মানচিত্র বৃত্ত হয়েছে; বিভিন্ন সময়ে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছে; অনাচার-অত্যাচারের হাত থেকে দেশবাসী বাঁচার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। রাজনীতি এখানে সমস্যা সৃষ্টি করছে না। সমস্যার মূলে রয়েছে ব্যক্তিবিশেষের অযোগ্যতা ঢাকার লক্ষ্যে অপরাধীরাতির আশ্রয় নিয়ে স্বার্থসিদ্ধ করার প্রবণতা। যারা ক্যাম্পাসে অপরাধীরাতি করে বেড়ায় তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজে দেখলে দেখা যাবে, দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে, আলোচিত জায়গায় তারা বড় হয়নি, অতি বিদ্যা তাদের হৃদয়ের ময়লা ঘোচাতে পারেনি, মুখস্থ বিদ্যা



তাদের রেজাল্ট ভালো করতে সাহায্য করেছে কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষাজীবনে অনিয়ম করে তথাকথিত ভালো সনদ অর্জন করেছে। সর্বোপরি, তারা শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে নেয়নি। ভালো, নির্ভর্য চাকরি হল শিক্ষকতা, তাই রেজাল্টের জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়েছে। খুঁটে খুঁটে দেখলে আরও দেখা যাবে, তারা হয়তো কেউ কেউ 'প্রফেসর' হয়ে গিয়েছেন; কিন্তু নিজে এককভাবে একটি প্রবন্ধও লিখে প্রকাশ করতে পারেননি। গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করা তো বহু দূরের কথা। অনেকে কোনো গবেষণা না করেই আপগ্রেডেশনের বদলিতে উচ্চতর পদে নিয়োগপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেছেন। নামকাওয়াস্তে কিছু প্রবন্ধ অন্যদের নামের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে দিয়েছেন। এমন প্রবন্ধও আছে যা লিখতে একজনই যথেষ্ট, সেখানে রয়েছে চার-পাঁচজনের নাম রচয়িতা হিসেবে। কোয়ালিটির কথা বাদই দিলাম। কোয়ালিটির বিষয়টি দেখার কোনো সিস্টেমিক পন্থা তো নেইই; এমনকি এ ব্যাপারে কারও কোনো গরজও নেই। প্রশাসনের যাদের দেখার কথা, তারা থাকেন নন—একাডেমিক কাজে বেশি ব্যস্ত। চিন্তা-ভাবনার সময় কোথায়? কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যদি রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত ভিজিটর নিয়ে বাস্তব থাকেন, তিনি কখন একাডেমিক উন্নয়নের চিন্তা করবেন? দিনের বেলায় যদি তিনি বিভিন্ন বিভাগের/ইন্সটিটিউটের হরেক রকমের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে কেবল মালাবরণ করতে থাকেন কিংবা বাইরের জগতে অপ্রয়োজনীয় সভা-সেমিনার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, কখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির কথা ভাববেন? যদি তিনি প্রত্যেক দিন না হলেও অন্তত সপ্তাহে দুই-তিন দিন ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে না দেন, যাকে ব্যবস্থাপনার ভাষায় বলা হয় 'ম্যানেজমেন্ট বাই ওয়াকিং এরাউন্ড', তাহলে তিনি কীভাবে বুঝবেন কোথায় কী হচ্ছে, কোথায় কী প্রয়োজন, ক্যাম্পাসের কোথায় অবৈধ কাজকর্ম হচ্ছে, কোথায় গাঁজার আসর বসছে, কোথায় মাদকের ব্যবসা চলছে, কোথায় আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করছে, ক্যাম্পাসের কোথায় সৌন্দর্যবর্ধন প্রয়োজন, কোন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সময়মতো অফিসে আসছেন না অথবা এসেও অন্যত্র সময় দিচ্ছেন কিংবা কারা ক্লাস

ফাঁকি দিয়ে লাউজে বসে আড্ডা মারছেন। সময় কোথায় তার শিক্ষার্থীদের মনের কথা শোনার? তারা কী চায়, কী তাদের সমস্যা, সামাজিক চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের চাহিদার পরিবর্তন হচ্ছে কোথায়, কীভাবে এসবের সমাধান করা যায়, আরও কত কী! প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তি হবেন একজন সত্যিকারের মাঠকর্মী। তিনি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসবেন, তাতে সমস্যা নেই। ফাইল ওয়ার্ক তো করবেনই; কিন্তু তার কর্মজগৎ এর বাইরেও বিশালাকারে বিস্তৃত। সেই বিশালতাকে বোঝা খুব জরুরি। কেউ এটিকে আমার নছিয়ত বলে মনে করবেন না, আশা করি। এটিই বাস্তবতা, সমাজেরও প্রত্যাশা। প্রশাসক এবং শিক্ষক সবারই রাজনীতি হবে শিক্ষার্থীর জন্য কল্যাণমুখী। এমনটি হলে কেউ শিক্ষক রাজনীতির দিকে আঙুল তুলে কথা বলবে না। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ১৯৮১-৮৩ পর্যন্ত গবেষক-শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি সেখানকার শিক্ষকরা কর্মরত অবস্থাতেই এমপি হতে পারেন, রাজনীতি চর্চা করতে পারেন। আমার একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, ম্যানেজমেন্টের প্রফেসর ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বন্ধু, লোকসভার সদস্য ছিলেন। শিক্ষক রাজনীতি সেখানেও আছে; কিন্তু তা কলুষিত হয়নি। শিক্ষার্থীরা জানেই না কোন শিক্ষক কোন দলের। যা হয় নীরবে হয়। দোষ যদি কিছু হয় তা ব্যক্তি বিশেষের জন্য হয়, রাজনীতি সেজন্য দায়ী নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সুস্থ রাজনীতিকে ধারণ করেই কীভাবে শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষাজন নিশ্চিত করা যায়, সে সম্পর্কে কিছু করণীয় রয়েছে। আমার ভাবনা এখানে তুলে ধরলাম : (ক) ঢাকাসহ মোট চারটি

বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের 'বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ' অনুযায়ী চলে আর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে নিজ নিজ আইন অনুযায়ী। সবাই স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। সব আইনেই উপাচার্যদের অপরিমিত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আইন সংস্কারের মাধ্যমে এ ক্ষমতার রাশ টানা দরকার। আইনে উ-উপাচার্য প্রায় ক্ষেত্রে কোনো ক্ষমতাই দেয়া হয়নি। উপাচার্য ইচ্ছা করলে কিছু কাজের দায়িত্ব দেন; না দিলে তাদের কিছুই করার থাকে না। এটিও সুস্থ ক্ষেত্রের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।... (খ)... সাধারণভাবে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নীতিমালা সনাতনী। একমাত্র উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়। শুধু মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে কি একজন শিক্ষকের যোগ্যতা যাচাই করা সম্ভব? একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সার্বিক দায়িত্বের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। একজন আদর্শ শিক্ষকের থাকতে হবে সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বাচনভঙ্গি, সাবলীল ভাষার প্রয়োগে বিষয়—বস্তু ব্যাখ্যা করার দক্ষতা, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ভাব প্রকাশের ক্ষমতা, উভয় ভাষায় গুরু করে লেখার যোগ্যতা, গবেষণা পদ্ধতি বনমনসিকতা, ক্লাসরুমে সঠিক শিক্ষা-শিখন কল্পিত ব্যবহারের ওপর দখল, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার কৌশল-জ্ঞান এবং সর্বোপরি, শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার মতো বিষয়বস্ত্তিত্তিক জ্ঞানের গভীরতা। রেজাল্ট ভালো হলেই শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয়ে যায় না। তাই সঠিকভাবে যাচাই-বাহাই করতে হলে লিখিত পরীক্ষা নেয়া এবং ক্লাস ডেমোন্স্ট্রেশন জরুরি। এগুলোতে যোগ্য মনে হলে শিক্ষকতার এপটিটিউড টেস্ট করাও প্রয়োজন। আর মৌখিক পরীক্ষায় ৫/১০-এর বেশি নম্বর থাকা ঠিক নয়। বেশি নম্বর থাকা মানে অনিয়মের সুযোগ করে দেয়া। (গ) আশির দশকের প্রথম দিকে আপগ্রেডেশন সিস্টেম খুবই ভালো উদ্দেশ্যে করা হলেও এর অপব্যবহার সর্বজনবিদিত। উল্লিখিত শর্তাবলি ঠিকঠাকভাবে পালন করা হলে সমস্যা কখনও হতো না। শর্ত মানা হয়, তবে এর মধ্যে থাকে অনেক কাহিনী। যেমন—'বর্তমান' পদে কত বছর সক্রিয় কাজের অভিজ্ঞতা দরকার তা নির্ধারিত আছে; কিন্তু বাস্তবে অনেক